শবে বরাত ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত । শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে আক্বীদাগত ও আমলগত অসংখ্য শিরক.-বিদআত ও রসম-রেওয়াজ । কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামী শরীয়তে শবে বরাতের অবস্থান কি সে বিষয়ে দলীল-প্রমাণ নির্ভর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

শবে বরাত

শায়খুল হাদীস মুফতী
মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৩ ইং

মূল্য: ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

Shoba barat
Shaikh Mufti Muhammad Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 40.00 Tk. US.$ 2.00

সূচীপত্র

শবে বরাত

শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে আরবীতে لَيْلَةُ النِّصْفِ مِـــنْ شَـــعْبَانَ শাবানের মধ্যরজনী বলা হয়। বাংলাদেশসহ পাক ভারত উপমহাদেশে এ রাতটি 'শবে বরাত' হিসেবে পরিচিত। 'শবে বরাত' শব্দ দু'টি ফার্সী 'শব' মানে রাত আর 'বরাত' মানে ভাগ্য। একত্রে শব্দ দু'টির অর্থ হচ্ছে ভাগ্যরজনী। যারা এ রাতটি উদযাপন করে তারা বিশ্বাস করে যে, এ রাতে মানুষের আগামী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। তাই তাদের ধারণা মতে এ রাতকে শবে বরাত- মানে ভাগ্য রজনী বলা হয় । এ রাতকে পবিত্র মনে করে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদযাপন করা হয়।

শবে বরাত উপলক্ষে যা করা হয়

সুর্যাস্তের পর গোসল করা, রাতে সমবেতভাবে মসজিদে অবস্থান করে সালাত, যিকর, কুরআন তেলাওয়াত, কবর যিয়ারত, মিলাদ, ভোর রাতে সমবেত মুনাজাত করা, পরের দিন সাওম পালন করা ইত্যাদি। এদিন ব্যাপকভাবে হালুয়া রুটি তৈরী করা ও বিতরণ করা। শবে বরাতকে ঘিরে যে আকীদা পোষণ করা হয় এবং এ রাতটিকে যেভাবে উদযাপন করা হয় কুরআন- সুন্নাহ তে এর কোন ভিত্তি আছে কি?

মুসলিম হিসেবে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব আমরা যে কোন বিশ্বাস পোষণ করব তা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতেই করব। যে কোন কাজ করব তা কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতেই করব। সওয়াবের আশায় কোন কাজ করলে তা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত কিনা তা দেখতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা যা সমর্থিত তাই ইবাদত। যে কাজের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর সমর্থন নেই তা ইবাদত নয় বরং তা বিদআত। তা কোনো সওয়াবের কাজ হতে পারে না।

শবে বরাতকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে জঘণ্য অপরাধ

শবে বরাতকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হলো, শবে বরাত প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের সুরা দুখানের তিন ও চার নং আয়াতকে দলীল প্রমাণ হিসেবে পেশ করা। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ও পূর্বের আহলে কিতাবরা যেভাবে নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য আল্লাহর কালামকে বিকৃত করে, দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে, মনগড়া ব্যাখ্যা করে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছে ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর রেডিও টেলিভিশনে বক্তব্য প্রদানকারী ও পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখক আলেম 'শবে বরাত'কে প্রমাণ

করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে জোর করে সুরা দুখানের তিন নং ও চার নং আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। অথচ শবে বরাতের কথা পবিত্র কুরআনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সুরা দুখানের যে আয়াত দুটো শবে বরাতের সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয় তা যে, শবে কদর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, শবে বরাত সম্পর্কে নয় তা একজন সাধারণ জাহেল, মুর্খ লোকও একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে। সেকারণে প্রথমেই আমরা উক্ত আয়াতদ্বয়ের সঠিক তাফসীর পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো। অতঃপর 'শবে বরাতে' আমাদের করণীয় ও বর্জণীয় বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরবো। ইনশাআল্লাহ!

'শবে বরাত মর্যাদার রাত, এ রাতে ভাগ্য বন্টন হয়' এ ধারণার ভিত্তি কি?

যারা শবে বরাতকে মর্যাদার রাত মনে করে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এ রাতে মানুষের আগামী এক বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়, তারা তাদের এ ধারণা ও বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন মাজীদের সূরা দুখানোর নিচের আয়াতগুলোকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন-

حم – وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ – إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ– فِيهَا يُفْرَقُ كُـــلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ – أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا

'হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়, আমার নির্দেশে।' (সুরা দুখান: ১-৬)

শবে বরাতের মর্যাদা ও এ রাতে সকল বিষয়ে আল্লাহ (সুব.) থেকে চূড়ান্ত ফায়সালা হয় বলে যারা বিশ্বাস করে তারা বলেন যে, আয়াতে উল্লেখিত 'লাইলাতুন মুবারাকাতুন' বরকতময় রাত হচ্ছে মধ্য শাবান রজনী অর্থাৎ শবে বরাত। আর এ রাতেই প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা চূড়ান্ত হয়।

আয়াতে উল্লেখিত বরকতময় রাত কোনটি?

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, সুরা দুখানের তিন নং আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

''নিশ্চয়ই আমি ইহা (কুরআন) এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি।' এ আয়াতের আগের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ 'সুসুস্পষ্ট কিতাবের

শপথ'। এ আয়াত সহ মোট তের বার আল্লাহ (সুব.) তাঁর কিতাব কুরআন মাজীদকে 'কিতাবুম মুবীন' মানে সুস্পষ্ট কিতাব হিসেবে অভিহহিত করেছেন। এই সুস্পষ্ট কুরআনে খুবই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কুরআন নাজিল হয়েছে রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়। আর কুরআন নাজিলের রাত যেটি 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা বরকতময় রাত সেটিই। এখন আমরা সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কোন মাসে নাজিল হয়েছো? রামাদান মাসে না শাবান মাসে? সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব স্পষ্টভাবে উত্তর দিবে- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ 'রমযান মাস- যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।' (বাকারা ২:১৮৫) এবারে আমরা সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করবো, আমরা বুঝলাম তুমি রামাদান মাসে অবতীর্ণ হয়েছো। তবে রামাদানের কোন সময়ে নাজিল হয়েছো? রাতে না দিনে? রাতে হলে কোন রাতে? উত্তরে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব কুরআন মাজিদ স্পষ্টভাবে উত্তর দিবে- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয় আমি ইহা (কুরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি।' (সুরাঃ ক্বদরঃ ১) এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদ নাজিল হয়েছে রামাদান মাসের লাইলাতুল কদর বা শবে কদরে শবে বরাতে নয়। আর সুরায়ে দুখানের তিন নং আয়াতের শুরুতে কুরআন নাজিলের রাতকেই লাইলাতুম মুবারাকা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

حم – وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ – إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

'হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে।' (সুরা দুখানঃ ১-৬)

এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ।' তার পরই বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আমি ইহা বরকতময রাতে নাযিল করেছি।

কুরআন যে মহান আল্লাহর কিতাব, তিনি নিজে সুস্পষ্টভাবে বলছেন, কুরআন রমযান মাসে নাযিল হয়েছে। রমযানের কোন দিন বা রাতে নাযিল হয়েছে তাও সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি কদরের রাতে নাযিল করেছেন্ এত স্পষ্ট করে বলার পর 'বরকতময় রাত' বলতে কোন রাতকে বুঝানো হয়েছে তাও সুস্পষ্ট । এ রাত অন্য কোন রাত নয় , এ বরকতময় রাত হচ্ছে 'কদরের রাত।'

তাফসীর বিশারদগণের মতে সব চেয়ে বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য সঠিক তাফসীর হচ্ছে কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর। কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে

কুরআন নাযিল হয়েছে রমযান মাসে অপর দিকে আরো নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে কুরআন কদরের রাতে নাযিল হয়েছে্ কদর রাত যে রমযান মাসে এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। তাই কুরআন অনুযায়ীই সূরায়ে দুখানের তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত 'বরকতময় রাত' হচ্ছে কদরের রাত। অন্য কোন মাসের কোন রাত নয়। এখন আমরা ইসলামের গ্রহণযোগ্য তাফসীরের কিতাবসমূহ থেকে জানার চেষ্টা করবো সুরা দুখানে বর্ণিত لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ 'বরকতময় রাত' বলতে কোন রাতকে বুঝানো হয়েছে। শবে বরাত না শবে কদর।

তাফসীর বিশারদদের মত

তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনের বক্তব্যঃ

'অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে শবে কদর বোঝানো হয়েছে, যা রামাদান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে মোবারক বলার কারণ হলো, এ রাত্রিতে আল্লাহ (সুব.) এর পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাজিল করা হয়েছে। সুরা কদরে إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয় আমি ইহা (কুরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি।' (সুরাঃ ক্বদরঃ ১) এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন মজীদ শবে কদরে নাজিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে কদরকেই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ (সুব.) নবীদের প্রতি যত কিতাব নাজিল করেছেন, তা সবই রামাদান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাজিল হয়েছে। কাতাদাহ থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ইবরাহীম (আ.) এর সহীফাসমূহ রামাদানের প্রথম তারিখে, তাওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কুরআন মজীদ চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতেবরকতের রাত্রি বরে শবে বরাত অর্থাৎ শাবন মাসের পনের তারিখের রাত্রিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতরণ কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ও إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কুরআন শবে বরাতে নাজিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শাবানের

পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা লায়লাতুননিস্‌ফ নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকত হওয়া ও এতে রহমত নজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোনো কোনো রেওয়ায়েত রহমত নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِنْ عِنْـــدِنَا এ রত্রিতে প্রত্যে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। আনাস ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ কুরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে। মাহদভী বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ (সুব.) কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যা পূর্বে নির্দিষ্ট ছিল তা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট মালায়েকাদের নিকট অর্পণ করা হয়। কেননা, কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ (সুব.) এসব ফায়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাত্রিতে এগুলোর স্থির করার অর্থ এই যে, যে মালায়েকাদের মাধ্যমে ফয়সালা ও তাকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রীতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।' (মাআরেফুল কুরআন সুরা দুখানের ৩-৪ নং আয়াতের তাফসীল দ্রষ্টব্য)

তাফসীরে ইবনে কাসির (র.) এর বক্তব্য:

يقول تعالى مخبرا عن القرآن العظيم: إنه أنزله في ليلة مباركة، وهي ليلة القـــدر، كمـــا قال تعالى إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وكان ذلك في شهر رمضان، كما قال: تعالى شَـــهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

'আল্লাহ (সুব.) কুরআন সম্পর্কে অবহিত করণার্থে ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন মাজীদকে একটি বরকতময় রাতে নাজিল করেছি। আর সে রাতটি হলোঃ লাইলাতুল কদর। কেননা তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 'আমি এ কুরআনকে লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছি।' (কদর ৯৭:১) আর লাইলাতুল কদর অবশ্যই রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়। কেননা আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- 'রামাদান হলো সে মাস, যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে।' (বাকারা ২:১৮৫) (ইবনে কাসীর সুরা দুখানের ৩ ও ৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান এর বক্তব্য:

وقوله : إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق

'লাইলাতুম মুবারাকাহ বা বরকতময় রাত বলতে নিশ্চিতভাবে লাইলাতুল কদরকেই বলা হয়েছে।' (তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইমাম শওকানী আরও বলেন:

الليلة المباركة ليلة القدر كما في قوله تعالي انا أنزلناه في ليلة القدر

বরকতময় রাত হচ্ছে কদরের রাত যেমন আল্লাহ বলেছেন,' আমি ইহা কদরের রাতে নাযিল করেছি।' তিনি আরো বলেন:

ووصف الله سبحانه وتعالي هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القران فيها وهو مشتمل علي مصالح الدين والدنيا

এ রাতে কুরআন নাযিলের জন্য আল্লাহ রাতকে বরকতময় রাত হিসেবে বিশেষিত করেছেন। আর এ কুরআন দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কল্যাণের ধারক। (ফাতহুল কাদরি, ক; ৪, পৃ: ৫৭০)

ইমাম শওকানী লাইলাতুল কদরের পক্ষে নিজের অভিমতকে ব্যক্ত করে, কেউ কেউ বরকতময় রাত বলতে মধ্য শা'বান রজনী (শবে বরাত) বলেন, তাও উল্লেখ করেছেন। এর পর তিনি বলেন-

والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النـــصف من شعبان لأن الله أجملها هنا و بينها في سورة البقرة بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القران و بقوله في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر– فلم يبق بعد هذا البيانالواضع ما يوجب الخلاق و لاما يقتضي الشتباه.

সত্য ও সঠিকতো তাই যা জমহুর (নিরঙ্কুশ অদিকাংশের) মত। আর তা হলো,'বরকতময় রাত' হচ্ছে কদরের রাত, মধ্য শা'বান (তথা শবে বরাত) নয়। কেননা আল্লাহ এ আয়াতে বিষয়টি ইঙ্গিতে বলেছেন কিন্তু সূরায়ে বাকারয় এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। "রমযান মাস- যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।" অনুরূপ সূরায়ে কদরে বলেছেন। "নিশ্চয় আমি ইহা কদরের রাতে নাযিল করেছি।" এই সুস্পষ্ট বর্ণনার পর কোন মত বিরোধ থাকতে পারেনা। কোন সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। (ফাতহুল কাদীর খ: ৪, প্র:৫৭০)

তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনের বক্তব্য:

والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة ، إنا كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان ، كما ورد في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس

'আলোচ্য লাইলাতুল কদর রাতকেই সুরা দুখানে লাইলাতুম মুবারাকাহ বা বরকতময় রাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।' (তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, সুরা কদরের তাফসীল দ্রষ্টব্য)

তাফসীরে কুরতুবীর বক্তব্য:

والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال : ليلة النصف من شعبان وقال عكرمة : الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. والأول أصح لقوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر. ومنهم من قال : إنها ليلة النصف من شعبان ؛ وهو باطل لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فنص على أن ميقات نزوله رمضان ، ثم عين من زمانه الليل ها هنا بقوله فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله ، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها

বরকতময় রজনী হচ্ছে কদরের রাত। বলা হয়ে থাকে যে এটি শা'বানের মধ্যরজনী (শবে বরাত)। ইকরামা বলেছেন- এখানে যে রাতের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে শাবোনের মধ্যরাত। প্রথম বক্তব্যটি সঠিক, কেননা আল্লাহ (সূব.) ইরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় আমি ইহা কদরের রাতে নাযিল করেছি।' কাজী আবু বকর আল আরাবী বলেছেন, নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটি কদরের রাত্ তাদের মধ্যে কেউ বলেছেন, এটি শাবানের মধ্যরজনী (শবে বরাত)। এটি একটি বাতিল (অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য) মত। কেননা আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত সত্য কিতাবে বলেছেন,

'রমযান মাস- যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।' এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে কুরআন নাযিলের সময়কাল রমযান। অত:পর রমযানের কোন সময়টি তা নির্ধারণ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে 'বরকতময় রাত।' যে মনে করবে এটি অন্য কোন রাত সে বস্তুত: আল্লাহর উপর বড় ধরনের মিথ্যা আরোপ করবে। শাবানের মধ্যরজনী (শবে বরাতের) মর্যাদা ও এতে মানুষের হায়াত-মউত লিপিবদ্ধ করা হয়- এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস নেই। অতএব তোমরা এ রাতের প্রতি কোন গুরুত্ব দিবে না। (কুরতুবী, খ:১৬, পৃ: ১২৭)

ইমাম নববীর বক্তব্য:

ইমাম নববী প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় কদর রাতের মর্যাদা অধ্যায়ে বলেন:

قال العلماء و سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والأجال التي تكون في تلك السنة كقوله –تعالي فيها يفرق كل أمر حكيم و قوله تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر. وقيل سميت ليلة القدر لعظم قجرها وشرفها

ওলামায়ে কেরাম বলেন, কদরের রাতকে কদর বলার কারণ হচ্ছে এ রাতে ফেরেশতাগণ (মানুষের) ঐ বছরের ভাগ্য, জীবিকা, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি লিখেন্ যেমন আল্লাহ (সূব.) ইরশাদ করেছেন,' এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।'

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, ' এ রাতে ফেরেশেতাগন এবং রূহ তাঁদের প্রভুর নির্দেশে সকল বিষয় নিয়ে অবতরণ করেন্'

কেউ কেউ বলেছেন, কদরের রাতের বড় ধরনের মর্যাদা ও সম্মানের কারণেই এ রাতের নামকরণ করা হয়েছে কদরের রাত। (শরহে মুসলিম, খ; ৮, পৃ: ৫৭)

ইমাম নববীর এ বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বরকতময রাত আর কদরের রাত একই রাত।

পরবর্তী আয়াতে বর্নিত হয়েছে- فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ 'এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।'

এ আয়াতের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন:

أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها مـــن الآجـــال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها، وقوله جلَّ وعلا حكيم أي محكم لا يبدل ولا يغير

অর্থাৎ কদরের রাতে লওহে মাহফুজ থেকে লিখক ফেরেশতাগণের নিকট আগামী এক বছরের ফরমান জারী করা হয়। আগামী বছরের শেষ পর্যন্ত সময়ের জীবন-মৃত্যু, জীবিকা আরো যা ঘটবে। 'হাকীম' মানে মুহকাম অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তনযোগ্য নয়। (ইবনে কাসীর সংক্ষিপ্ত, খ: ৭, পৃ: ১৪৫)

এরপর ইরশাদ হচ্ছে , 'আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী।' আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে- আয়াতের এ অংশের সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে। 'বরকতময় রাতে' সকল গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হয, এ রাতে লেখক ফেরেশতাগনের প্রতি মানুষের ভাগ্য, জীবিকা, জীবন সহ প্রথিবীর সকল বিষয়ে যে ফায়সালা হয়, সব কিছুই আল্লাহর নির্দেশে হয়।

পূর্ববর্তী আয়াত ও আলোচ্য আয়াতের এ অংশের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে বরকতময় রাত (ليلة مباركـــة) আর কদরের রাত একই রাত

সূরায়ে কদরে আল্লাহ (সূব.) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ – وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ – لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ – تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

'নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে।' তোমাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী? লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে।' (কদর ৯৭:১-৪)

আর সুরায়ে দুখানে ইরশাদ করেছেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ –فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ – أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا

'নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়, আমার নির্দেশে।' (দুখান ৪৪:৩-৫)

সুরায়ে দুখান ও সুরায়ে কদরে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে একই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, বরকতময় রাত ও কদরের রাত একই রাত।

তাফসীরে রুহুল মা'আনীর বক্তব্য:

إِنَّا أنزلناه أي الكتاب المبين الذي هو القرآن على القول المعول عليه فِى لَيْلَةٍ مباركـــة هي ليلة القدر على ما روي عن ابن عباس . وقتادة . وابن جبير . ومجاهد . وابن زيد . والحسن . وعليه أكثر المفسرين والظواهر معهم ،

'লাইলাতুম মুবারাকাহ বা বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। এটা ইবনে আব্বাস, কাতাদা, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, ইবনে যায়েদ, হাসান প্রমুখদের মত এবং এটাই অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনদের মত এবং বাস্তবতাও এ মতেরই স্বপক্ষে।' (তাফসীরে আলূসী সুরা দুখানের ৩-৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

তাফসীরে কাশ্‌শাফের বক্তব্য:

والقول الأكثر أنّ المراد بالليلة المباركة : ليلة القدر ، لقوله تعالى إِنَّا أنزلناه فِـــى لَيْلَـــةِ القدر القدر ولمطابقة قوله فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ لقوله تَنَزَّلُ الملائكة والروح فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ وقوله تعالى شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أُنزِلَ فِيهِ القرآن وليلة القـــدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان

'অধিকাংশ ওলামাদের মতামত হলো, লাইলাতুম মুবারাকা দ্বারা লাইলাতুল কদরকে বুঝানো হয়েছে..... ।' (তাফসীরে কাশ্‌শাফ উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

শবে বরাতে ইবাদতের নামে বিদআত

ভারতবর্ষের মুসলিম জনগোষ্ঠির নিকট মধ্য শাবানের রাত 'শবে বরাত' নামে পরিচিত। বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তারা এই রাতকে উদযাপন করে। মাগরিবের পরপরই গোসল করা। গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে সাতশত রাকাত নফল সালাতের সওয়াব পাওয়া। নফলকে ফরজের চেয়ে বেশী, শবে বরাতকে শবে কদরের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া। সারা রাত জেগে জেগে ফজরের সালাত কাজা করা। সালাত বাদ দিয়ে হালুয়া-রুটি তৈরী করা। দল বেঁধে কবর জিয়ারতের নামে বিভিন্ন মাজারে দৌড়-ঝাঁপ করা। মাজারে টাকা-পয়সা দান করা। মাজার ওয়ালার কাছে প্রার্থণা করা, সিজদা করা, আগরবাতি-মোমবাতি প্রজ্জলিত করা। সালাতুর রাগায়েব বা সালাতুল আলফিয়াহ নামে শবে বরাতের বিশেষ নামাজ চালু করা। আরবী 'আল্‌ফ'

শব্দের অর্থ হাজার। প্রতি রাকাতে সুরায়ে ফাতিহার পরে দশবার সুরায়ে ইখলাস পাঠ করার মাধ্যমে একশত রাকাতে মোট একহাজার বার সূরা ইখলাস পাঠ করতে হয় বলে এই সালাতের নাম দেয়া হয়েছে সালাতুল আলফিয়া। আর এজন্য তৌর করা হয় একটি জাল হাদীস। হাদীসটি হলো-

من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك : ثلاثون يبشرونه بالجنـــة ، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا . وعشرة يـــدفعون عنه مكايد الشيطان ونزول الرحمة قال عليه الصلاة والسلام:

'যে ব্যক্তি এই রাতে (শবে বরাতে) একশত রাকাত সালাত আদায় করবে আল্লাহ (সুব.) তার নিকট একশত মালায়েকা প্রেরণ করেন। ত্রিশজন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, ত্রিশজন তাকে জাহান্নামের থেকে নিরাপত্তা দেয়, ত্রিশজন তার থেকে দুনিয়ার বালা-মুসিবত দূর করে দেয়। আর দশজন তার থেকে শয়তানের ধোঁকা সমূহ প্রতিরোধ করে। আর তার উপর রহমত নাজিল করতে থাকে।' (তাফসীরে কাশ্‌শাফ সুরা দুখানের ৩-4 আয়াতের তাফসীর)

অথচ এই ধরণের হাদীসের ইসলামে কোনো ভিত্তিই নেই। সম্পূর্ণ ভূয়া ও বিদআতিদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনগড়া জাল হাদীস। এছাড়া শবে বরাতে আরো যে বিদআত করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো শেষরাতে সম্মিলিতভাবে বাতি বন্ধ করে দীর্ঘ মুনাজাত করা, জামাতবদ্ধভাবে সালাতুত তাসবীহ আদায় করা, মসজিদগুলোকে মন্দিরের মতো আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা, সারা রাত পটকাবাজী করা। এছাড়া আক্বিদাগত শিরক-বিদআতের মধ্যে রয়েছে- এই রাতকে সৌভাগ্য রজনী তথা আয়ূ-রুজি বৃদ্ধি করা, সারা বছরের হায়াত মউতের তালিকা তৈরী করা, মৃত্যু রূহগুলো সকল আত্নীয়-স্বজনের সাথে মোলাকাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসা, বিশেষ করে বিধবাদের এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাদের স্বামীদের রূহ এই রাতে ঘরে ফিরে। এ জন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের জন্য বুক বেঁধে বসে থাকা, মৃত ব্যক্তিদের রূহকে স্বাগত জানানোর জন্য মোমবাতি, আগরবাতি, আতশবাজি ও পটকাবাজির মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে এই আক্বিদা পোষণ করা যে, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিলো বিধায় ব্যাথার জন্য নরম খাদ্য হিসেবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন। তার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করে হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছিলো

অহুদের যুদ্ধে। আর অহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর শবে বরাত পালনকারীরা ব্যাথ্যা অনুভব করছে তার প্রায় দুমাস আগে শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে। বাহ! হালুয়া রুটি খাওয়ার কি সুন্দর মনগড়া কাহানী।

শবে বরাতের উৎপত্তি যেভাবে

চারশ হিজরীর আগেই সকল অগ্নীপূজারীদের দেশ মুসলিমদের দখলে চলে আসে। 'বারামাক' নামক একশ্রেণীর অগ্নীপূজারী তাদের অন্তরের বিশ্বাসকে অটল রেখে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে। তারা নিজেদের অগ্নীপূজা ঠিক রেখে মুসলিম জাতিকেও এ পূজার সাথে জড়িয়ে দেয়ার জন্য কিছু জাল হাদীস তৈরী করে। মুসলিমদের ধোঁকা দিতে আবিষ্কার করে শবে বরাত নামক অগ্নীপূজার এক নতুন পন্থা। চালু করে সালাতুর রাগায়েব বা শবে বরাতের নামাজ। আর এজন্য তারা মসজিদগুলোকে এমনভাবে সজ্জিত করতো দেখে মনে হতো অগ্নী মন্দির। বায়তুল মাকদিস মসজিদের একশ্রেণীর বিদআতী আলেমদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বায়তুল মাকদিসে এই বিদআত চালু হয়। এ প্রসঙ্গে তিরমিজির প্রসিদ্ধ শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' নামক কিতাবে বলা হয়েছে-

وأول حدوث لهذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثمان وأربعين وأربعمائة قال وقد جعلـــها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما شبكة لجمع العوام وطلبا لرياسة التقدم وتحصيل الحطام ثم إنه أقام الله أئمة الهدى في سعي إبطالها فتلاشى أمرها وتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل سني المائة الثامنة قيل أول حـــدوث الوقيـــد مـــن البرامكة وكانوا عبدة النار فلما أسلموا أدخلوا في الاسلام ما يموهون أنه مـــن ســـنن الدين ومقصودهم عبادة النيران حيث ركعوا وسجدوا مع المسلمين إلى تلك النيران

'সর্বপ্রথম ৪৪৮ হিজরীতে একশ্রেণীর মূর্খ বিদআতী ইমামদের মাধ্যমে এই বিদআত বায়তুল মাকদিস মসজিদে চালু হয়। সালাতুর রাগায়েবসহ নানান প্রকার বিদআতের মাধ্যমে তারা সাধারণ মুসলিম জনতা ও ছাত্র-যুবকদের তাদের জালে আটকানোর মাধ্যমে পার্থিব স্বার্থ, সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে। পরবর্তীতে কুরআন ও সুন্নাহের সঠিক অনুসারী হকপন্থী ইমামদের কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিদআত বিলুপ্ত হয়। ৩৫২ বছর চলার পর মিসর, শামসহ সমগ্র আরবদেশ থেকে ৮০০ হিজরীর শুরুর

দিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। ফিলিস্তীন সহ সমগ্র আরব এলাকাতে বন্ধ হলেও ইরানে চলতে থাকে এই বিদআত মহা ধূমধামে। ইরানের অগ্নীপূজক মাজূসী থেকে বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী শীয়া মুসলিমদের মাধ্যম হয়ে এ বিদআত গোটা ভারতবর্ষে সংক্রামিত হয়। ভারতের দিপালী পূজায় অভ্যস্ত অগ্নী পূজারী হিন্দুরা নামে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম শাষকদের আস্থাভাজন হয়ে দিপালী পূজার মহা ষড়যন্ত্র শবে বরাতের নামে মুসলিমদের ভিতরে অনুপ্রবেশ ঘটায়। এরা শাসকদের কাছে নিজেদের ধার্মীক ও বুযুর্গ প্রমান করে। বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ইবাদত তৈরী করে। তারই ধারাবাহিকতায় শবে বরাত আবিষ্কার করে মুসলিমদেরসহ অগ্নীপূজার মহোৎসব পালন করতে থাকে।

শবে বরাত উদযাপনের ভিত্তি কি?

যারা শবে বরাতের মর্যাদায় বিশ্বাসী তারা এ রাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক সালাত, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির, কবর যিয়ারত ইত্যাদি আমলের মাধ্যমে এ রাতকে উদযাপন করে। তাদের বিশ্বাস এ রাতে গুনাহ মাফ হয়। তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে কয়েকটি জয়ীফ (দূর্বল) ও মাওজু (জাল) হাদীস। নিম্নে এ ধরণের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا . فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر

'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন শাবান মাসের মধ্য রাত্রি আসবে তখন সে রাত্র ইবাদতে কাটাবে আর দিন কাটাবে সাওমের মাধ্যমে কেননা আল্লাহ (সুব.) সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করে বলেন, কোন ক্ষমাপ্রার্থণাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করবো? কোনো রিযিক অন্বেষণ কারী আছে কি যাকে আমি রিজিক দিব? কোনো বিপদগ্রস্থ আছে কি যাকে আমি বিপদমুক্ত করবো? এরূপ আছে কি? এরূপ আছে কি? এভাবে ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন।' (ইবনে মাজাহ ১৩৮৮)

হাদীসটি ইবনে মাজাহ তার সুনানে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে (বর্ণনা পরম্পরায়) আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ বিন আবু সুবরাহ নামে একজন রাবী রয়েছেন তাকে ইমাম বুখারী দূর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার সম্পর্কে

ইমাম আহমদ বিন হাম্মল এবং ইবনে মুঈন বলেন, এ লোক মিথ্যা হাদীস রটাতেন। ইমাম নাসায়ী বলেছেন, এ লোকটি প্রত্যাখান যোগ্য। (মিযানুল ই'তিদাল ৪/৫০৩-৫০৪)

তাই হাদীস বিশারদগণের মতে হাদীসটি দূর্বল। দ্বিতীয়ত: হাদীসটি সহীহ হাদীসের পরিপন্থি। এ হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, মধ্য শাবান রজনীতে (শবে বরাত) আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন। অথচ একটি সহীহ হাদীসের বক্তব্য এটির বিপরীত। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

'আবু হুরাইরা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমাদের মহান রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতেই পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করে বলেন, যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দিব। যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করবো।' (বুখারী ১১৪৫; মুসলিম ১৮০৮; তিরমিজি ৩৪৯৮; আবু দাউদ ১৩১৭)

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ফজর (ভোর হওয়া) পর্যন্ত' মানে আল্লাহ (সুব.) তার বান্দাদের এভাবে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।

এ হাদীসটি শুধু বুখারী বা মুসলিমে নয় প্রায় সব হাদীস গ্রন্থেই সর্বমোট ত্রিশজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মুহাদ্দীসগণের সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। এ হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে বিশ্বজাহানের রব পৃথিবীর আকাশে নেমে আসে অথচ ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, শাবানের মধ্য রজনী (শবে বরাতে) আল্লাহ (সুব.) প্রথম আকাশে নেমে আসেন। একদিকে হাদীসটি দূর্বল অপরদিকে এর বক্তব্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। তাই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

শবে বরাতের সপক্ষে দ্বিতীয় দলীল:

শবে বরাতের পক্ষে আরেকটি হাদীস হলো:

عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع

فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقال إن الله عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে খুজে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি তাকে খুঁজতে বের হয়ে দেখি তিনি 'বাকীতে' আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে দোআ করছেন। আয়শাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি কি মনে করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর জুলুম করেছেন? আয়শা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধারণা করেছিলাম আপনি আপনার অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে এসেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, শাবান মাসের মধ্যরাতে আল্লাহ (সুব.) প্রথম আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি 'কালব' গোত্রের ছাগলের পালের লোমের চেয়েও অধিক সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দেন।' (তিরমিজি ৭৩৯; ইবনে মাজাহ ১৩৮৯; আহমদ ২৬০১৮)

হাদীসটি ইমাম আহমদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি বলেন-

قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة و الحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير

'এই হাদীসটি এই সনদ ব্যতিত অন্য কোনো সনদে আমার জানা নেই। আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীসটি দূর্বল হিসেবে চিহ্নিত করতে শুনেছি এবং তিনি বলেছেন এই হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছীর তার ওস্তাদ উরওয়া থেকে শুনেনি এবং হাজ্জাজ ইবনে আরতা তার ওস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছীর থেকে শুনেননি।' (তিরমিজ ৭৯৩)

ইমাম বুখারী (র.) যাকে হাদীস শাস্ত্রের আমীরুল মুমিনীন বলা হয়, তিনি এ হাদীসটিকে দূর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে হাদীসটির বক্তব্য পর্যালোচনা করলে তার দূর্বলতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ প্রদত্ত্ব অহী দ্বারা পরিচালিত হতেন। তিনি যা করতেন এবং যা বলতেন তা অহীর ভিত্তিতেই করতেন ও বলতেন। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যা কল্যাণকর তা তাদের বলে দেওয়া এবং যা তাদের জন্য ক্ষতিকর তার

থেকে সতর্ক করা ছিল রাসূল হিসেবে তার মৌলিক দায়িত্ব। তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিলো যে, তিনি যেন সবকিছু পৌঁছে দেন। ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

'হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দাও।' (মায়েদা ৫:৬৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.) তার রেসালাতের জীবনে তার প্রতি ন্যাস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে না পেয়ে তাকে খোঁজার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে 'বাকিতে' (মদীনার কবরস্তান) গিয়ে তাকে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আয়শাকে লক্ষ্য করে বললেন, শাবানের মধ্য রজনী (শবে বরাতে) আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং 'কালব' গোত্রের ছাগলের পালের লোমের চেয়েও অধীক সংখ্যক মানুষকে ক্ষমা করে দেন। এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এত মর্যাদা সম্পন্ন একটি রাত সম্পর্কে সন্ধার আগ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরামকে জানালেন না। তাদেরকে জানালে তারাওতো ইবাদতের সুযোগ পেত। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের পরিবারের কাউকে এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই জানালেন না এবং তাদের ইবাদত করার জন্যও বললেন না। অথচ রামাদানের শেষ দশ রাতের ব্যাপারে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

'আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, রমাদানের শেষ দশ দিন আসলে রাসূলুল্লাহ (সা.) রাত জাগতেন, পরিবারের লোকজনকে জাগিয়ে দিতেন এবং কোমড় বেঁধে সক্রিয়ভাবে ইবাদতে লেগে যেতেন।' (মুসলিম ২৮৪৪; আবু দাউদ ১৩৭৮; নাসায়ী ১৬৩৮; ইবনে মাজাহ ১৭৬৮)

শাবানের মধ্য রজনী (শবে বরাত) যদি এত মর্যাদা সম্পন্ন রাত হতো তাহলে অবশ্যই পরিবারের লোকদের অবহীত করতেন এবং তাদের জাগিয়ে দিতেন। আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে বা মসজিদে গিয়ে ইবাদত করেননি। তিনি চলে গেলেন কবরস্থানে। কবরস্থানতো ইবাদতের স্থান নয়। এসব বিশ্লেষনের প্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি খুবই দূর্বল। শবে বরাত পন্থী আলেমগণ শবে বরাতের মর্যাদা ও এর এত ইবাদতের পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে যে দলীল-প্রমান পেশ করে থাকেন উপরে তার

পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, সুরা দুখানের আয়াতে বর্ণিত, 'বরকতময় রাত' শবে কদর সেটি মোটেই শবে বরাত নয়। আর প্রমান হিসেবে যে দুটি হাদীস তারা বেশী বেশী পেশ করে থাকেন সেদুটি হাদীসও মুহাদ্দিসগণের হাদীস বিশ্লেষণ ও যুক্তির মানদন্ডে দূর্বল প্রমাণিত হলো। শুধু এ দুটো হাদীসই নয় শবে বরাত সংক্রান্ত যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো হাদীসই দূর্বল (জয়ীফ)। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে রজব হাম্মলী বলেন, এমর্মে বর্ণিত অন্য সকল হাদীসও দূর্বল। (লাতায়েফুল মাআরিফ : ইবনে রজব)

শবে বরাতে পরিকল্পনা শবে কদরে বন্টন?

কোনো কোনো আলেম শবে বরাতের হাদীস ও শবে কদরের হাদীসের সামাঞ্জস্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বলেছেন- যে শবে বরাতে মূলত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আর শবে কদরে তা দায়ীত্বশীল মালায়েকাদের কাছে বুঝিয়ে দেয়া হয়। আর কুরআন নাজিলের কথা? তাও শবে বরাতে নাজিল করা শুরু হয়েছে। যেমন সূফীবাদী গ্রন্থ তাফসীরে বায়যাবীতে বলা হয়েছে-

إِنَّا أنزلناه فِى لَيْلَةٍ مباركة ليلة القدر ، أو البراءة ابتدىء فيها إنزاله ، أو أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ ، ثم أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نجومـــاً وبركتها لذلك ، فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والدنيوية أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الأقضية.

'বরকতময় রাত দ্বারা উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর অথবা লাইলাতুল বারাআত যে রাতে কুরআন নাজিলের সূচনা হয়....' (তাফসীরে বায়যাবী সুরা দুখানের ২-৩ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা কেননা পরিকল্পনা যা করার তা আল্লাহ (সুব.) অনেক আগেই করে রেখেছেন।

লাইলাতুল কদরে লাউহে মাজফুজে সংরক্ষিত ভাগ্য লীপি হতে পৃথক করে আগামী এক বছরের ভাগ্য লীপি তথা হায়াত-মাওত, রুজি-রোজগার ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা ঘটানো হবে তা লেখক মালায়েকাদের নিকট প্রেরণ করা হয়। মূল তাকদীর আল্লাহ (সুব.) তার মহা পরিকল্পনায় বহু পূর্বেই লিখে রেখেছেন তার প্রমান পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ – وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ

'আর তারা যা করেছে, সব কিছুই 'আমলনামায়' রয়েছে। আর ছোট বড় সব কিছুই লিখিত আছে।' (ক্বমার ৫৪:৫২-৫৩)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليـــه وســـلم– يَقُولُ « كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ – قَالَ – وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আসমানসমূহ এবং জমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ (সুব.) স্বীয় মাখলুকের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন।' (মুসলিম ৬৯১৯) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ

'নবী (সা.) বলেন, হে আবু হুরাইরা! ভবিষতে যা ঘটবে কলম তা লিখে শুকিয়ে গিয়েছে।' (বুখারী ৫০৭৫; তিরমিজি ২৬৪২; নাসায়ী ৩২১৫)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَـــا خَلَـــقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَد

'ওবাদা ইবনে সামেত (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ (সুব:) সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। অত:পর কলমকে বললেন, লিখ! কলম বলল কি লিখব? আল্লাহ (সুব:) বললেন, তাকদীর লিখ, যা সংঘটিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে তা সবকিছু লিখ।' (সুনানে তিরমিজি ৩৩১৯)

এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ (সুব.) মহা পরিকল্পনা বহুপূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই শবে বরাতে না কোনো কিছুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় আর না ভাগ্য লেখা হয়। বরং আল্লাহর মহা পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ করা তাকদীর সমূহ প্রতি বছর শবে ক্বদরে দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়।

তাকদীরের মাসআলা

কদর বা (ভাগ্য) হল: আল্লাহর অনন্ত জ্ঞান ও হিকমাত অনুযায়ী সৃষ্টি কূলের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ। আর ইহা আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভরশীল, তিনি সর্ব

বিষয় ক্ষমতাশীল তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ্‌র (সুব:) রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। আর ইহা ঈমানের ছয়টি রুক্‌নের অন্যতম একটি রুক্‌ন, এর প্রতি ঈমান আনা ছাড়া এই ছয়টি রুক্‌নের প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে না। মূলত: কদর বা তাকদীর হলো আল্লাহর (সুব:) সৃষ্টি সম্পর্কীয় মহা পরিকল্পনা। আল্লাহ (সুব:) এর নিকট কোন অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত নেই। তার কাছে সব কিছুই বর্তমান। এ কারণেই তিনি সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে নির্দেশ দিলেন, লিখ! কলম প্রশ্ন করলো, কি লিখব? আল্লাহ (সুব:) বললেন, লিখ যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা সংঘটিত হবে। এ থেকে বুঝা যায় অনন্ত ও অনাদীকাল পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে তা সবকিছুই আল্লাহর (সুব:) সেই মহা পরিকল্পনার বাস্তবয়ন। এ ব্যাপারে হাদীসে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِى جَنَّتِهِ ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَىْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ مُوسَى بِأَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ آدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَفَتَلُومُنِى عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.

‘আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আদম ও মূসা (আ:) তাদের রবের নিকটে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। এবং আদম বিজয় লাভ করলেন। মূসা (আ:) আদম (আ:) কে বললেন, আপনিতো সেই আদম, আপনাকে আল্লাহ (সুব:) নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি নিজেই আপনার ভিতরে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। মালায়েকাদের মাধ্যমে আপনাকে সেজদা করালেন। আপনাকে আল্লাহ (সুব:) জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দিলেন। কিন্তু আপনি আপনার ভূলের কারণে মানব জাতিকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। উত্তরে আদম (আ:) বললেন: তুমি তো মূসা (আ:)। তোমাকে আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রেসালাত ও সরাসরি কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন।

তোমাকে তাওরাত খন্ড সমূহ দিয়েছেন। যাতে সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তোমাকে আল্লাহ (সুব:) নির্জনে কথা বলার জন্য নৈকট্য দান করেছেন। আচ্ছা! তুমি বলোতো: আল্লাহ (সুব:) আমাকে সৃষ্টির কতবছর পূর্বে তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন। মূসা (আ:) বললেন, চল্লিশ বছর পূর্বে। আদম (আ:) বললেন, আচ্ছা বলতো তুমি কি তাওরাতে এ কথাটি পেয়েছো ‘আদম তার রবের হুকুম আমান্য করলো ফলে সে বিভ্রান্ত হলো’? মূসা (আ:) বললেন, হ্যাঁ! এবার আদম (আ:) বললেন তাহলে তুমি কি আমাকে এমন একটি বিষয়ে তিরস্কার করছো যে বিষয়টি আল্লাহ (সুব;) আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: অত:এব মুসা (আ:)আদম (আ:) এর উপর জয়যুক্ত হলেন।’ (সহীহ মুসলিম ৬৯১৪; সহীহ বুখারী ৩৪০৯)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্ম পূর্বের থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয় নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি থেকে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

‘আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী (সা:) একটি জানাযায় ছিলেন। সেখানে কিছু একটা হাতে নিয়ে (চিন্তামগ্ন অবস্থায়) মাটিতে মৃদু আঘাত করতে লাগলেন। অত:পর বললেন, তোমাদের প্রতিটি মানুষের ঠিকানা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা আছে। হয়তো জাহান্নামে নতুবা জান্নাতে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তাহলে আমাদের লিখিত কিতাব (তাকদীর) এর উপর ভরসা করে থাকবো না? এবং আমল করা ছেড়ে দিব না? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, না! তোমরা আমল করতে থাক। নিশ্চয় যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে ঐটার কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের (জান্নাতীদের) অন্তর্ভূক্ত তার জন্য সৌভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি হতভাগাদের (জাহান্নামীদের) অন্তর্ভূক্ত

তার জন্য হতভাগাদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে।’ (সহীহ বুখারি ৪৯৪৯; সহীহ মুসলিম ৬৯০৩)

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابن عباس قال كنت خلفت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات ...واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعـــوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعواعلى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بـــشيء قـــد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

‘আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পিছনে বসে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন: হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিব। (কথাগুলো মনে রাখবে) ...আর জেনে রাখ! যদি গোটা জাতি একত্র হয় কোন বিষয়ে তোমার উপকার করার জন্য। তবে তারা সকলে মিলে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ (সুব:) তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে যদি গোটা জাতি একত্র হয় কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করার জন্য তবে সকলে মিলে তোমার অতটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ (সুব:) তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে রাখা হয়েছে এবং (তাকদীর লিখিত) কিতাবগুলো শুকিয়ে গেছে।’ (সুনানে তিরমিজি ২৫১৬)

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, তাকদীরে লেখা আছে বলেই আমরা যে কোন ন্যায়-অন্যায় কাজ করি তা কিন্তু নয় । বরং আল্লাহ (সুব:) যেহেতু অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবকিছু জানেন সেহেতু তিনি আমরা যা কিছু করবো বা না করবো সব জানেন। তাই তিনি সবকিছু পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সেজন্য আমরা করি তা নয় বরং আমরা করবো তা তিনি জানেন তাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, আল্লাহ (সুব:) যখন জানেন যে, আমরা অন্যায় করবো তাহলে তিনি তো বাঁধা দিলেই পারতেন। কেন আমাদেরকে অন্যায় ও পাপকাজ করার সুযোগ দিলেন? তার জবাবে আমরা বলবো, যেহেতু পৃথিবীটা একটা পরীক্ষার হল। এখানে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। আর পরিক্ষার হলে নিয়ম হলো যে ভুল লেখে তাকে হলের ভিতরে সংশোধন করে না দিয়ে বরং সে যা লেখে তাতেই তাতে সহযোগীতা করা হয় প্রয়োজনে

আরো বেশী ভূল লেখার জন্য অতিরিক্ত কাগজ দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি ভাবে এই পৃথিবীতেও কেউ যদি নেক আমল করতে চায় তাকে আল্লাহ (সুব:) স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক সাহায্য করেন। আবার কেউ যদি গোমরাহ হতে চায়, অন্যায়-পাপাচারে লিপ্ত হতে চায় তাতেও আল্লাহ (সুব:) তাকে বাধা প্রদান করেন না। মানুষকে আল্লাহ (সুব:) একটা ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেছেন সে অনুযায়ী মানুষ কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে। তার ইচ্ছার সাথে যদি আল্লাহ (সুব:) তাওফীক সহায়ক হয় তাহলে সে ঐ কাজটি করতে পারে। নতুবা করতে পারে না।

এক্ষেত্রে আলী (রা:) এর একটি সুন্দর ঘটনা আছে: তার কাছে দুটো লোক এলো। একজন জাবরিয়া মতবাদের আরেকজন কাদরিয়া মতবাদের। একজন বললো, আমি যা ইচ্ছা করি তাই করতে পারি এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কোন ভূমিকা নাই। অপরজন বললো: আমি যা কিছু করি সব কিছুই আল্লাহ (সুব:) করান। আমার নিজের কোন দোষ নেই। এই মতবাদের লোক বর্তমানেও পাওয়া যায়। যারা বলে ‘যেমনে নাচাও তেমনে নাচি, পুতুলের কি দোষ” আলী (রা:) উভয় ব্যক্তিকে বললেন, তোমরা একটি পা উপরে উঠাও, তারা উঠালো। অত:পর বললেন, অপর পা টিও উপরে উঠাও তারা শত চেষ্টা করেও তা পারলো না। আলী (রা:) বললেন, এখানেই তাকদীরের রহস্য নিহীত রয়েছে। প্রথম পা তোমরা উঠাবার ইচ্ছা করছো, আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন তাই উঠাতে পেরেছো। দ্বিতীয় পা টি উঠানোর ইচছা আগের মতই ছিল কিন্তু আল্লাহ (সুব:) তাওফীক দেন নাই। তাই তোমরা উঠাতে সক্ষম হও নাই। এটাই হলো তাকদীর। এখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের ইচ্ছা ক্ষমতাটাও সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন নয় বরং ওটাও আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

‘আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।’ (সুরা তাকভীর ৮১:২৯)

তাকদীরের বিষয়টি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এ সম্পর্কে নিয়ম হলো আমল করতে থাকা। বেশী জিজ্ঞাসাবাদ না করা এবং এই আক্বিদা পোষন করা যে আল্লাহ (সুব:) যা কিছু করেন ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিক করেন। সব কিছুই সুপরিকল্পিত ও সুপরিমিতভাবে করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

'নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিত রুপে সৃষ্টি করেছি।' (সুরা ক্বামার ৫৪:৪৯) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كُلُّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: "প্রত্যেক জিনিসই পরিমিত, এমনকি বোকা ও বুদ্ধিমত্তা অথবা অক্ষমতা ও পারদর্শীতা।' (সহীহ মুসলিম ৬৯২২)

সুতরাং শবে বরাতের সাথে তাকদীর বা ভাগ্য লেখার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

শাবান মাসে করণীয় ইবাদত

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কুরআন মাজীদ কিংবা সহীহ হাসীসে শবে বরাতে বিশেষ কোনো ইবাদতের উল্লেখ নেই। আমলের কিতাবসমূহে বর্ণিত নফল সালাতের নিয়ম ও বিশাল অংকের সওয়াব সম্বলিত হাদীসগুলো হয়তো জাল নয়তো জয়ীফ। দু একটি হাসান বা জয়ীফ হাদীসের ভিত্তিতে কোনো কোনো আলেম ব্যক্তিগতভাবে তাওবা-ইস্তেগফার করা, নফল সালাত আদায় করা, শেষরাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা ও আইয়্যামে বীজের নফল সাওম পালন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বেশী বেশী ইবাদত করতেন এবং উম্মতকেও উৎসাহিত করতেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ – رضى الله عنهما – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لَهُ أَوْ لآخَرَ أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অথবা অন্য কোনো সাহাবীকে বললেন, তুমি কি শাবানের মধ্যমভাগের সাওমগুলো পালন করেছো? লোকটি বললো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যখন রাখোনি তাহলে একদিন বা দুদিন সাওম পালন করো।' (মুসলিম ২৮০৮; বুখারী ১৯৮৩; আবু দাউদ ২৩৩০)

এই হাদীসে বর্ণিত سـرر শব্দটির অর্থ কেউ কেউ মাসের শেষভাগকে বুঝিয়েছেন। কেননা এ সময় চাঁদ পর্দাবৃত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ

মাসের মধ্যম অংশকে বুঝিয়েছে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য 'আইয়্যামে বীজ' এর সাওম।

শাবান মাসের ইবাদতের কয়েকটি হাদীস

শাবান মাস রামাদান মাসের আগমনী বার্তা বয়ে আনার মাস। তাই রামাদান মাসের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শাবান মাসে বেশী বেশী ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

'আয়শা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাওম আদায় করতে থাকতেন আমরা বলতাম তিনি আর সাওম ছাড়বেন না। আবার তিনি সাওম ছাড়তে থাকতেন এমনকি আমরা বলতাম তিনি সাওম রাখবেন না। রামাদান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে পূর্ণ মাস সাওম রাখতে আমরা দেখিনি। শাবান মাসে তিনি বেশী বেশী সাওম রাখতেন।' (বুখারী ১৯৬৯; মুসলিম ২৭৭৯; তিরমিজি ৭৩৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا

'আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) শাবান মাসের থেকে বেশী কোনো মাসে সাওম রাখতেন না। শাবান মাস পুরোটাই তিনি সাওম রাখতেন। অবশ্য সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করো। কেননা আল্লাহ (সুব.) ততক্ষণ পর্যন্ত বিরক্ত হবেন না যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালাত সেটাই যেটা স্থায়ী হয় যদিও তা পরিমানে কম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও যখন কোনো সালাত শুরু করতেন তা স্থায়ীভাবে আমল করতেন।' (বুখারী ১৯৭১; মুসলিম ১৮৬৯; মুসনাদে আহমদ ২৪৫৪০)

এ হাদীসে পুরো শাবান মাস সাওম রাখার কথা বলা হয়েছে। এটা হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্য খাস আমল ছিলো নতুবা বেশীর ভাগ সময় সাওম

রাখাকে পুরো সময় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা কোনো কোনো হাদীসে শাবান মাসের শেষভাগে সাধারণ লোকদের সাওম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন শাবান মাস অর্ধেক শেষ হয়ে যায় তোমরা সাওম রেখো না।' (আবু দাউদ ২৩৩৯; নাসায়ী কুবরা ৮২১৬)

শাবান মাস কেন্দ্রীক বিদআত

অনেকের ধারণা শবে বরাতে যদিও কোনো বিশেষ ইবাদত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা সত্ত্বেও করলে অসুবিধা কি? নিষেধ তো আর নেই। মূলত এটাই সকল বিদআতিদের দলীল। তারা জানে না, এভাবে ইবাদতের নামে বিদআত তৈরী করার কারণেই যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তণ করা হয়েছে। বর্তমানেও তাই হচ্ছে। শবে বরাতের গুরুত্ব দেয়ার কারণে ফরজ সালাতের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি শবে বরাতের কারণে শবে কদরও ম্লান হয়ে যায়। শবে বরাতে রাতভর নফল সালাত আদায় করার পরে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ না করা অথবা ফজরের সালাতের পরে অন্যান্য সালাতে হাজির না হওয়া বিদআতের কুফলই বলতে হবে। কোনো কোনো মসজিদে শবে বরাতে সালাতুত তাসবীহ জামাতে আদায় করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে এ সালাত কখনো জামাতে আদায় করেননি। কেউ হয়তো এখানেও বলবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এটা না করলেও আমরা করলে অসুবিধা কি? অসুবিধা একটাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলো করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) যেগুলো করেন নি বা করতে বলেন নি তা যতভালো উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন অবশ্যই বিদআত ও গর্হিত কাজ। অনেকে আবার বিদআতকে হাসানা ও সায়্যিআহ দু'ভাগে ভাগ করে এবং বিদআতে হাসানা বা ভালো বিদআত নাজায়েজ নয় বলে ফাতওয়া প্রচার করে। তাদের উদ্দেশ্যে বলবো- যারা বিদআতে হাসানা নামক ইবাদতকে ইসলামের ভিতরে ঢুকাতে চায় তারা মূলত: পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খিয়ানতকারী হিসাবে আখ্যায়িত করছে। একারণেই ইমাম মালেক (রহ:) বলেছেন:

من ابتدع بدعة فيراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان فى الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا

'যে ব্যক্তি কোন বিদআ'ত আবিস্কার করে আবার সেটাকে বিদআ'তে হাসানাহ বা ভালো বিদআ'ত মনে করে সে যেনো দাবী করলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের ভিতরে খিয়ানত করেছেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ **اليوم اكملت لكم دينكم** "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং যে সব কাজ তখন দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ছিল না তা বর্তমানেও দ্বীন নয়।' (মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪)

মূলত যারা বিদআতে হাসানার নাম দিয়ে নতুন নতুন ইবাদত তৈরী করে তারা আল্লাহর নাজিলকৃত শরিয়তের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া একটি নতুন শরিয়ত প্রণয়ন করছে। এ ধরণের লোকদের প্রতিবাদ করে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সুরা শুরা: ২১)

আমাদের সমাজে নানা ধরণের বিদআত চালু রয়েছে যা অনেক গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়ে থাকে। নিম্নে তার কিছু তালিকা দেয়া হলো:

মীলাদ খতমের বিদআত:

মানুষ মারা গেলে তিনদিনা মিলাদ, চল্লিশা মিলাদ, মৃত্যুবার্ষিকীর মিলাদ। আবার জন্মদিবস, ম্যারেজ ডে ইত্যাদি উদযাপন করা হয়। আবার এর সাথে কখনো কখনো যুক্ত হয় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম নামক আরেক বিদআত। অথচ এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে কিংবা তাঁর কোনো সাহাবী করেননি। কুরআন ও হাদীসে কোনো ভিত্তি নেই বরং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানো কিংবা কোনো প্রকার দুআ-অজিফা করানো সম্পূর্ণ হারাম। যে পড়ে সেও হারাম কাজ করে, যে পড়ায় সেও হারাম কাজ করে।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে নিম্নের আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا 'তোমরা আমার আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করো না।' (বাকারা ২:৪১)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে: **"ঈসালে সওয়াব উপলক্ষ্যে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয :** আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল-আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফক্বীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। কেননা পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমন্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুল মাল (ইসলামী ধনভান্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমন্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরী-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলে-মেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেক্বাহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। -- দুররে-মুখতার, শামী।

সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদেহের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোআ-কালাম ও অজিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে তারা উভয়েই গোনাহগার হবে। বস্তত: যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও

বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নি:সন্দেহে বিদ'আত।" (তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) পৃষ্ঠা ৩৫, সূরা বাক্বারা ৪১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

কবর-মাজার পূজার বিদআত:

ভারতবর্ষে আল্লাহর অলীদের শ্রদ্ধার নামে চালু হয়েছে নানা ধরণের বিদআত। জীবিত অবস্থায় তাদের কাশফ খোলা থাকার নামে 'আলেমুল গায়েব' দাবী করা। আল্লাহর ফয়সালা বদলে দেয়ার মতো ক্ষমতা দাবী করা। আল্লাহ ওয়ালাগণ ফানা ফিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার আক্বীদাহ পোষন করা। তাদের আল্লাহর মাঝে ও তাঁর বান্দাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারী হিসেবে ভায়া-মাধ্যম মনে করা। আর তারা মারা গেলে তাদের কবরকে মাজারে পরিণত করা। মাজারে গিলাফ চড়ানো। টাকা-পয়সা, আগরবাতী, মোমবাতি দেয়া। মাজারে সেজদা করা, তাওয়াফ করা, মাজারের নামে পশু যবাই করা। মাজারের নামে মানত করা। মাজার ওয়ালার কাছে প্রার্থণা করা। বাৎসরিক ওরশ পালন করা। এসব কিছুই শিরক-বিদআতযুক্ত মানুষের তৈরী করা মনগড়া শরিয়ত। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এসবের কোনো ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও কখনো করেননি, কাউকে করতে বলেননি এবং রাসূলের আদর্শে সৈনিক সাহাবায়ে কিরামগণ কখনো করেননি। এগুলো নিঃসন্দেহে বিদআত।

পীর-মুরিদীর বিদআত

ভারতবর্ষের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী বিদআতের নাম হলো পীর-মুরিদী। পীরের কাছে মুরিদ হওয়া ফরজ। পীরকে বিভিন্ন তরিকার বাইআত দিতে হবে- চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি সহ প্রায় সাড়ে তিনশ তরিকার বাইআত চালু আছে এই ভারতীয় উপমহাদেশে। মুসলিম জাতির খলীফাতুল মুসলিমীনদের বাইআতকে রাষ্ট্রিয় বা জাতীয় পর্যায় থেকে ছিনতাই করে পীর-মুরিদী নামক বিদআত চালু করে রাষ্ট্রিয় খিলাফত ধ্বংস করার স্থায়ী চক্রান্ত করা হয়েছে। শুধু তাই না! বিভিন্ন তরিকার স্বতন্ত্র যিকির-আযকার, দুআ-অজিফা আবিষ্কার করে কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত যিকির-আযকার ও দুআ-অজিফাকে নির্মূল করার চক্রান্ত করা হয়েছে। খতমে খাজাগান, দূরুদে নারিয়া, দূরুদে তাজ, দূরুদে হাজারী, হাফসে দমের যিকির, পাস-আনপাসের যিকির, ছয় লতিফার যিকিরসহ বহু ধরণের বিদআত চালু করেছে এই পীর-সূফীরা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তরিকার পরিবর্তে এ সকল তরীকার যিকির এদের কাছে বেশী তাছীর (প্রভাব) সৃষ্টি করে। এই পীর-সূফীদের আবার রয়েছে অনেক স্তর। গাউস, কুতুব, গাউসুল আজম, কুতুবুল ইরশাদ, কুতুবুল আলম, কুতুবে আকতাব, খাজা নাওয়াজ, বান্দা নাওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, জুলফে দারাজ, গেছুঁ দারাজ, আতা বখশ, গঞ্জে বখশ ইত্যাদি উপাধী দিয়ে পীর-সূফীদের আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। এমনকি তাদের অনেকের ধারণা অলীরা নবী-রাসূলদের থেকে বড়। কেননা নবী-রাসূলগণ অহী প্রাপ্ত হন জিবরাঈলের মাধ্যমে আর অলীরা ইলম অর্জণ করে সরাসরী আল্লাহর (সুব.) এর নিকট থেকে। তাছাড়া নবুওয়্যাত ও রিসালাত শেষ হয়ে যায় এবং হয়ে গেছে। কিন্তু বেলায়াত কখনো শেষ হবে না। এ বিবেচনায়ও অলীদের মর্যাদা নবী-রাসূলদের থেকে উর্দ্ধে। এভাবে অলীদের নবী-রাসূলদের সমতুল্য বা তার চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে তরীকত পন্থী নামে নতুন এক শরিয়তের জন্ম দিয়েছে পীর-সূফী নামধারী এই ভন্ড-প্রতারক, গরীর ও মেহনতী মানুষের টাকা-পয়সা আত্মসাৎকারী পীর সাহেব নামক বিনাপুজির ব্যবসায়ীরা।

এদের পীর-সাহেব যতদিন জীবিত থাকেন তিনি হন গদ্দীনাশীন আর তার বড় ছেলে হন শাহ সাহেব। গদ্দীনাশীন মারা গেলে শাহ সাহেব তার স্থলাভিষিক্ত হন। এভাবে পীর-মুরিদীর নামে এক রমরমা ব্যবসা চালু আছে ভারতবর্ষে। যে কারণে কোনো পীরকে গরীব দেখা যায় না। এরা মুরিদদের থেকে খেদমতের নামে পা টিপা, মাথা টিপা, শরীর চাপার মতো খেদমত নিয়ে থাকে। অনেক সুন্দর চেহারার পীরেরা তাদের মুরীদদের সুন্দরী স্ত্রী ও মেয়েদের বিশেষ খাদেমা নিয়োগ করেন বলে জানা যায়। এসকল নারীদের ভোগ করার জন্য তারা ব্যবহার করে শরীয়তের বিভিন্ন পরিভাষা। যেমন: তাদের প্রথমে ফানা অর্থ বুঝানো হয়: কারো মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অতঃপর ফানাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। ফানা ফিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। ফানা ফিররাসূল অর্থাৎ রাসূলের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং ফানা ফিশ শায়েখ অর্থাৎ পীরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অতঃপর তাদের বুঝানো হয় মাথা থেকে গলা পর্যন্ত ফালা ফিল্লাহ এর অংশ, গলা থেকে নাভি পর্যন্ত ফানা ফির রাসূলের অংশ আর নাভি থেকে নিচ পর্যন্ত ফানা ফিশ শায়েখ বা পীরের অংশ। এ শিক্ষা দেয়ার পর পীর তার মুরীদের সাথে অপকর্ম করতে আর কোনো বাঁধা থাকে না। এমনকি কোনো কোনো পীর সম্পর্কে শুনা যায় যখন সে তার মুরীদের স্ত্রী বা মেয়ের সঙ্গে জিনায় লিপ্ত হয়েছে আর মুরীদ তা দেখতে

পেয়েছে তখন মুরীদকে বুঝানো হয়েছে যে, যদিও বাহ্যিকভাবে তুমি তাকে জিনা করতে দেখতে পাচ্ছ, মূলত সে গভীর সমূদ্রে চলমান কোনো নৌযানের ছিদ্রপথ মেরামত করছে (নাউযুবিল্লাহ)। পীরের নির্দেশে শরিয়াত বিরোধী কাজ করা কোনো অন্যায় নয় বরং পীর যদি প্রকাশ্য শরিয়তের বিরুদ্ধেও কোনো হুকুম জারী করেন মুরীদের তা বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে এ ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি করা চলবে না। এ প্রসঙ্গে পীর-সূফীদের প্রায় সকল তরীকত পন্থিদের বইয়ে একটি প্রসিদ্ধ কবিতা পাওয়া যায়। আর তা হলো:

بمی سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید # کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزل

‘কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শারাব দ্বারাও জায়নামাজ রঙ্গীন করিয়া তাহাতে নামাজ পড়। অর্থাৎ শরীয়তের কামেল পীর সাহেব যদি এমন কোন হুকুম দেন, যাহা প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ হয়, তবুও তুমি তাহা নিরাপত্তিতে আদায় করবে। কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরী করিয়াছেন। তিনি তাহার উঁচু-নিচু অর্থাৎ ভালমন্দ সব চিনেন, কম বুঝের দরুন জাহেরিভাবে যদিও তুমি উহা শরীয়তের খেলাফ দেখ কিন্তু মূলে খেলাফ নহে।’ (‘আশেক মাশুক’ মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত ৩৫ নং পৃষ্ঠায়)

‘ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা’ এর ৭২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

عاشقاں را ملت و مذہب جدا ست # عاشقاں را ملت و مذہب خدا ست

‘মাওলানা রুমি ফরমাইয়াছেন: প্রেমিক লোকদের জন্য মিল্লাত ও মাজহাব ভিন্ন। তাহাদের মিল্লাত ও মাজহাব শুধু মা’বুদ কেন্দ্রিক।’
অথচ কুরআনে বলা হয়েছে:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহবান করছ

তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।' (শুরা ৪২:১৩)
এমনিভাবে হাদীসে বলা হয়েছে

عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

'উম্মে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য চলবে না।' (জামেউল আহাদীস: হা: ১৩৪০৫, মুয়াত্তা: হা: ১০, মু'জামূল কাবীর: হা: ৩৮১, মুসনাদে শিহাব: হা: ৮৭৩ আবি শাইবা: হা: ৩৩৭১৭, কানযুল উম্মাল: হা: ১৪৮৭৫)

শরিয়তের বিপরিতে কোন পীর, কোন আমীর কারোই আনুগত্য করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَلِىٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْضَبُوهُ فِى شَىْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِى حَطَبًا. فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ تَسْمَعُوا لِى وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى. قَالَ فَادْخُلُوهَا. قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنَ النَّارِ. فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوف

'আলী (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। এক আনসারী ব্যক্তিকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং সাহাবীদেরকে তাঁর কথা শুনা ও মানার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতপর তাদের কোন আচরণে সেনাপতি রাগ করলেন। তিনি সকলকে লাকড়ি জমা করতে বললেন। সকলে লাকড়ি জমা করলো এরপর আগুন জ্বালাতে বললেন। সকলে আগুন জ্বালালো। তারপর সেনাপতি বললো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার এবং আমার কথা শুনা ও মানার নির্দেশ দেন নি? সকলেই বললো, হ্যা। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সকলেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। এটা আমার নির্দেশ।

সাহাবীগণ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বললেন, আমরাতো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসেছি। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর তার রাগ ঠান্ডা হলো এবং আগুনও নিভে গেল। যখন সাহাবারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থাপন করা হলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন 'তারা যদি আমীরের কথা মতো আগুনে ঝাঁপ দিতো তাহলে তারা আর কখনোই তা থেকে বের হতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজেই।' (সহীহ মুসলিম হা:নং: ৪৮৭২ সহীহ বুখারী হা: নং: ৪৩৪০ সহীহ মুসলিম বাংলা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কতৃক তরজমা; হা: নং: ৪৬১৫)
এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়তের বিরূদ্ধে কারো হুকুমের আনুগত্য করা যাবে না। না কোন ওলী-বুযুর্গের না কোন পীরে মুগাঁর। আর না কোনো শাসকের।

মীলাদ-কিয়ামের বিদআত

ভারতবর্ষে আরেকটি বহুল প্রচলিত বিদআতের নাম হলো, মীলাদ-কিয়াম। মীলাদিদের রয়েছে দুটি শ্রেণী একদল বসে মীলাদ পড়ে যারা লা-কিয়ামী নামে পরিচিত। আরেকদল দাড়িয়ে মীলাদ পরে তারা ক্বিয়ামী নামে পরিচিত। দ্বিতীয় শ্রেণী মনে করে রাসূলুল্লাহ (সা.) মীলাদে স্বশরীরে হাজির হন তাই তাকে দাড়িয়ে সম্মান করা উচিত। যারা দাঁড়ায় না তারা বেয়াদব, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সম্মান দিতে জানে না। এরা নিজেদের কেউবা আশেকে রাসূল আবার কেউ বা রাসূল প্রেমিক দাবী করে। আর এজন্য আয়োজন করে বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলনের। এদের কিছু শ্লোগান হলো: 'ঘরে ঘরে মিলাদ দিন # রাসূলের শাফাআত নিন'। এরা রাসূল (সা.) এর জন্মদিনকে সকল ঈদের সেরা ঈদ হিসেবে জ্ঞান করে। এ জন্য তাদের শ্লোগন হলো, 'সকল ঈদের সেরা ঈদ # ঈদে মীলাদুন্নবী'। এ আক্বীদায় বিশ্বাসী লোকেরা নতুন কোনো দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বানিজ্য, বিয়ে-শাদী ইত্যাদিতে মীলাদ দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। তাছাড়া সওয়াবের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যেই মীলাদের আয়োজন করা হয়। অথচ এসকল আমল সবকিছুই বিদআত। রাসূলুল্লাহ (সা.) মীলাদের মাহফীলে রাসূল (সা.) এর হাজির হওয়ার আক্বীদা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

‘আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর একদল মালায়েকা রয়েছে যারা যমিনে বিচরণ করে বেড়ায়, যারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছায়।’ (নাসায়ী ১২৮১; মেশকাত ৯২৪; হাদীসটি সহীহ)

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) নিজে মীলাদে হাজির হন না বরং তার কাছে সালাম পৌঁছানো হয়।

তাছাড়া মীলাদ যেমন বিদআত তেমনি মীলাদে ক্বিয়াম করা আরেকটি বিদআত। সাহাবাগণ এ বিদআত করতেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَس قَالَ : " لَمْ يَكُنْ شَخْص أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَته لِذَلِكَ

‘আনাস (রা:) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসুলুল্লাহ (সা:) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলো না। অথচ তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তারা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না।” (সুনানে তিরমিযী ২৭৫৪)

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শেষ জীবনে দশ বছর খেদমত করেছেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামদের স্বচক্ষে দেখা বাস্তব আমল বর্ণনা করেছেন। সাহাবাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বশরীরে উপস্থিত হলেও তারা কিয়াম করতেন না। কেননা তারা জানতেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এটা পছন্দ করেন না। তাহলে বর্তমানে ভন্ড আশেকে রাসূলরা রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর চৌদ্দশত বছর পরে কাকে খুশী করার জন্য কিয়াম করে? রাসূলুল্লাহ (সা.) কে না শয়তানকে। অবশ্যই শয়তানকে খুশি করার জন্য। কেননা শয়তান জিনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতিসহ বড় বড় গুনাহ করলে যত খুশি হয় তার চেয়ে বেশী খুশি হয় বিদআত করলে। কারণ চোর-ডাকাত ইত্যাদি লোকেরা অন্যায় করলেও তারা এটাকে অন্যায়ই মনে করে সওয়াবের কাজ নয়। হয়তো জীবনের কোনো এক পর্যায়ে ভুল উপলব্ধি করে তাওবা করে নিবে। কিন্তু বিদআতী ব্যক্তি বিদআত করে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে। তার আর তওবা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং সে নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে। একারণেই শয়তান

মীলাদ, কিয়াম নামক বিদআতে খুশী হয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي مِجْلَز قَالَ " خَرَجَ مُعَاوِيَة , فَقَامَ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَابْن صَفْوَان حِين رَأَوْهُ فَقَالَ اِجْلِسَا , سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّل لَهُ الرِّجَال قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَده مِنْ النَّار

‘আবু মিজলায (র:) বলেন, মুআবিয়া (রা:) একদা বের হলে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং ইবনে সফওয়ান (রা:) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুআবিয়া (রা:) তাদেরকে বসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি চায় তার জন্য লোকেরা মূর্তির মত দাড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।’ (সুনানে তিরমিজি ২৭৫৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৫৫৮২)

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর জন্য দাঁড়ানো থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হাদীসে বর্নিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ « لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

‘আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) লাঠির উপর ভর করে আমাদের মাঝে আগমন করার জন্য বের হলেন। আমরা সকলে তার প্রতি দাঁড়িয়ে গেলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা দাড়িও না যেভাবে আজমী লোকেরা একে অপরকে সম্মান করার জন্য দাড়ায়।’ (আবু দাউদ ৫২৩২; মিশকাত ৪৭০০; হাদীসটি জয়ীফ)

এ হাদীসগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কারো সম্মানার্থে দাড়ানো কিংবা দাড়িয়ে থাকা কোনো সওয়াবের কাজতো নয়ই বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কারণে এবং ইবাদতের নামে বিদআত তৈরী করার কারণে ডাবল গুনাহগার হবে। তবে সম্মান প্রদর্শন ছাড়া বিশেষ কোন প্রয়োজনে দাঁড়ানো বা কাউকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়ানো জায়েজ। যেমন সাআদ (রা:) অসুস্থ ছিলেন বিধায় তাঁকে সওয়ারী থেকে নামানোর জন্য সাহাবায়ে কিরাম তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْد هُوَ ابْنُ مُعَاذ بَعَثَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, যখন বনু কুরাইযা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা:) এর ফায়সালায় (দূর্গ হতে) অবতরন করতে সম্মতি প্রকাশ করল তখন রাসূল (সা:) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আর তিনি তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকটেই অবস্থান করছিলেন। তিনি একটি গাধার উপরে সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটে পৌঁছলেন, তখন রাসুল (সা:) (আনসার সাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন: তোমরা তোমাদের সর্দারের দিকে এগিয়ে যাও।' (সহীহ বুখারী ৩০৪৩; সহীহ মুসলিম ৪৬৫৯)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কারো যদি সহযোগীতার জন্য দাড়ানো বা এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা সাআদ (রা.) বনূ কুরাইযার ঘটনার পূর্বে অহুদের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। আর সে কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের হুকুম দিলেন, তোমরা তোমাদের সর্দারের দিকে এগিয়ে যাও।

নবী রাসূলদের নামে বাড়াবাড়ি

এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আরেকটি বড় ধরণের বিদআত হলো: নবী-রাসূলদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা। এদেশের একশ্রেণীর মুসলমানরা বিশ্বাস করে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর জাতি নূরে তৈরী, তিনি মানুষ নন। এ কারণে তিনি আল্লাহরই একটি অংশ, ভিন্নকেউ নন। এ আক্বীদায় বিশ্বাসী লোকরা বলে থাকে:

محمد خدا نہیں # خدا سے جدا نہیں

'মুহাম্মদ খোদা নয়রে খোদার থেকে জুদা নয় # বাতির আলো বাতি নয়রে, বাতির থেকে জুদা নয়।

শুধু তাই না এজন্য তারা তৈরী করেছে অসংখ্য জাল হাদীস। তার মধ্য থেকে একটি জাল হাদীস হলো এই: انا احمد بلا میم وانا عرب بلا عین 'আমি আহমদ তবে মিম ছাড়া (অর্থাৎ আহাদ), আর আমি আরব তবে আইন ছাড়া (অর্থাৎ রব)।

এ কারণেই কোনো এক সূফীবাদী কবি তার কবিতার মাধ্যমে এই আক্বীদা ব্যক্ত করেছেন:

আহমদের ঐ মিমের পর্দা তুলে দেরে মন # দেখবি সেথায় করছে বিরাজ আহাদ নিরঞ্জন।' (নাউযুবিল্লাহ)

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা যেভাবে তাদের নবী-রাসূলদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এ উম্মতেরও কিছু অংশ ঠিক সেভাবেই নবী রাসূলদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বরং তার চেয়ে বেশী করে। কেননা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা নবী রাসূলদের আল্লাহর পুত্র দাবী করেছে। আর এ তথাকথিত মিথ্যাবাদী আশেকে রাসূলরা একধাপ এগিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আল্লাহর অংশ বানিয়ে দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই বলেছেন:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ

'ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছিলো খৃষ্টান জাতি ইসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে (তারা ঈসা আ. কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছিলো)। তাই তোমরা আমার ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলো আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।' (সহীহ বুখারী ৩৪৪৫; মুসনাদে আহমদ ১৫৪)

এ তথাকথিত মিথ্যাবাদী আশেকে রাসূলগণ আরো জঘণ্য আক্বীদা পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কবরে জীবিত আছেন। অথচ কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন বলেই তাকে দাফন করা হয়েছে। জীবিত লোকদের কেউ দাফন করে কি? পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।' (আল ইমরান ৩:১৪৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারা সকলে মৃত্যু বরণ করবে।' (যুমার ৩৯:৩০)

রাসুল (স) অতি মানব ছিলেন না যে, তিনি মৃত্যু বরণ করবেন না। বরং তিনি ছিলেন মানুষ নবী, তাই তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। উল্লেখিত প্রমাণাদি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) একজন মানুষ নবী ছিলেন।

সকল নবী-রাসূলগণ মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদের রাসূল (সা:) যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন বিষয়টি অনেকের কাছেই অস্পষ্ট ছিল। এমনকি ওমর বিন খাত্তাব (রা:) তরবারী হাতে ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ (সা:) মরে গেছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। একারণে রাসূল (সা:) এর মৃত্যু নিয়ে একটি ধুম্রজালের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর যখন আবু বকর আসলেন তিনি আয়েশার হুজরায় চলে গেলেন এবং চাঁদর উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ (সা:)কে চুমু খেলেন। এবং বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা কুরবান হোক, আপনাকে আল্লাহ (সুব:) দুইবার মৃত্যু দিবেন না। যে মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বরাদ্দ ছিল তা আপনি গ্রহণ করেছেন। একথা বলে চাঁদর ঢেকে দিয়ে তিনি জনসম্মুখে এলেন। এবং নিম্নের ঐতিহাসিক খুৎবাটি দিলেন:

عَنْ عَائِشَةَ .....فقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَـالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا

'আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি (আবু বকর রা:) বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মদ (সা:) এর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ মুহাম্মদ (সা:) মৃত্যুবরণ করেছেন, আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব:)চিরঞ্জীব তার কোন মৃত্যু নেই। এরপর তিনি কুরআন মাজিদের নিম্মোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন: **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ** ... 'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।' (সুরা আল ইমরান ৩:১৪৪)

এ আয়াত শোনা মাত্র সকলের কাছে মনে হলো যে, তারা ইতিপূর্বে এ আয়াত কখনো শুনেন নাই, আবু বকর থেকেই প্রথম শুনলেন এবং সকলের মুখে মুখে

এ আয়াত উচ্চারিত হতে লাগলো।' (সহীহ বুখারী ১২৪১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

'আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে ?' (আম্বিয়া ৩৪)

তাছাড়া একথা কিভাবে গ্রহণ করা যায় যে, তিনি নূরের তৈরী, অথচ যাকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য, অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ হিসেবে আল্লাহ পাঠালেন মাটির মানুষদের কাছে। নূরের তৈরী সৃষ্টির প্রকৃতি, চাল-চলন তো হবে ভিন্ন, তাকে কিভাবে মানুষ পুরোপুরি আদর্শ হিসেবে গ্রহন করে তার যথাযথ অনুসরণ করবে। যাদের বিবেক বুদ্ধি আছে, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ ব্যাপারে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

বিদআত থেকে সাবধান

বিদআত বর্জন করা সম্পর্কীত কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِـي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

'আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান হবে।' (সহীহ বুখারী ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম ৪৫৭৯; সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৭) অন্যত্র এরশাদ করেছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِـذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

'তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খেলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর, তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও ধর্মে (দ্বীনে) নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআ'ত এবং প্রত্যেক বিদআ'তই পথভ্রষ্টাত।' (সহীহ মুসলিম ৪৬০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২; মুসনাদে আহমদ ১৭১৪৫)

রাসূল (সা:) জুম'আর দিন খুৎবায় নিয়মিত বলতেন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا خَطَبَ...يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআ'ত এবং এরূপ প্রতিটি বিদাআ'ত-ই পথভ্রষ্টতা।' (সহীহ মুসলিম ২০৪২; সুনানে নাসায়ী ১৫৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪৫) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة

'হাস্‌সান (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তখন আল্লাহ (সুবঃ) ঐ পরিমাণ সুন্নাত তাদের থেকে তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না।' (সুনানে দারেমী ৯৮; মিশকাতুল মাসাবীহ ১৮৮, হাদীসটি সহীহ)

শবে বরাতে দলবদ্ধভাবে কবর-মাজার যিয়ারত করা যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণভালো কাজ হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) অবশ্যই তার সাহাবীদের নিয়ে কবরে যেতেন। অথচ যে দূর্বল হাদীসটি দিয়ে বিদআতি আলেমগণ দলীল পেশ করেন সে দূর্বল হাদীসটিতেও বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) অতি গোপনে একা গিয়েছিলেন। মূলত কবর-মাজার পূজারী লোকেরা তাদের সপক্ষে কোনো একটি হাদীস পেলেই তাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। হাদীসটি সহীহ না জয়ীফ না জাল তা তারা বিবেচনা করে না। অথচ জাল হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাবধান করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা কথা বললো সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিলো।' (বুখারী ১০৭; মুসলিম ৪; তিরমিজি ২৬৫৯; আবু দাউদ ৩৬৫৩)

বিদআতে হাসানাহ-সায়্যিআহ

অনেকে বিদআতকে দুভাগে ভাগ করে। ক. হাসানাহ খ. সায়্যিআহ। বাস্তবে ইসলামে এর কোনো ভিত্তি আছে কিনা? না! ইসলামে বিদআতে হাসান বলতে

কিছু নেই। বিদআতিরা নিজেদের বিদআতকে মুসলিম সমাজে বাজারজাত করার জন্য বিদআতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ আবিষ্কার করেছে। পরবর্তীতে কিছু হক্বপন্থী আলেমরাও তাদের ফাঁদে আটকে যায়। মূলতঃ দ্বীনের ভিতর সকল বিদআতই হারাম। যারা বিদআতকে হাসানাহ ও সায়্যিআহ বলে বিভক্ত করে, তারা ভুল করে থাকেন এবং রাসূল (সাঃ) এর হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে থাকেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'তোমরা নব আবিস্কৃত কার্যাবলী হতে সাবধন। কেননা নব আবিস্কৃত সবকিছুই বিদআত আর নিশ্চয়ই সকল বিদআত গোমরাহী।' (মুসনাদে আহমদ ১৭১৪৪; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২)

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদআত প্রসঙ্গে রায় দিতে গিয়ে বলেছেন সকল বিদআতই গোমরাহী। আর বিদআতিরা বলছেঃ না, সকল বেদআত গোমরাহী নয় বরং কিছু বেদআত আছে হাসানাহ (ভাল)।

আল্লামা হফেয ইবনে রজব বলেনঃ নবী আকরাম (সা.) এর বাণী (সকল বিদআত গোমরাহি) ব্যাপক অর্থ বোধক বাক্য। কোন কিছুই তার বহির্ভূত নয়। সকল প্রকারই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বীনের একটি বিশেষ মূলনীতি। এটি রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য। আল্লাহর রাসূল বলেন **مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ** 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটি পরিত্যাজ্য হবে।'

সুতরাং যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করবে এবং তাকে দ্বীনের দিকে নিসবত (সম্বন্ধযুক্ত) করবে অথচ দ্বীনে তার কোন মূল ভিত্তি নেই যার দিকে সে ফিরতে পারে, সেটিই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। দ্বীন এ সকল বস্তু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বিদআতকে যারা ভাগ করে তাদের যুক্তি প্রমাণ ও তার খণ্ডনঃ

বিদআতীগণ নিজেদের নব উদ্ভাবিত বিদআতকে বৈধতা দেয়ার জন্য কিছু হাদীস ও কিছু উদাহরণ পেশ করে থাকে। আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো।

বিদআতীদের প্রথম দলীলঃ ওমর (রাঃ) একবার সালাতে তারাবীহ সম্পর্কে বলেছিলেন : **نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ** (কত না সুন্দর বেদআত এটি) বেদআতকে

হাসানাহ ও সাইয়্যেআহ দ্বারা বিভক্তকারীদের নিকট ওমরের (রা:) এ উক্তিটি ব্যতীত তাদের মতের স্বপক্ষে আর কোন সহীহ দলিল নেই।

খন্ডন: ওমর রা. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য বিদআতে শরয়ী নয়। বরং শাব্দিক অর্থে বিদআত বলেছেন। কেননা ইসলামী শরীয়তে বিদআত বলা হয় **احداث في الدين مالا اصـــل لـــه** 'দ্বীনের ভিতর এমন কিছু তৈরী করা যার কোনো ভিত্তি নেই।' দ্বীনের ভিতর বলার কারণে যে সকল নব আবিষ্কৃত কাজ পার্থিব জীবনের উন্নয়ণের জন্য তৈরী করা হয়েছে সেগুলো বিদআতের সংঙা থেকে খারিজ হয়ে গেছে। আর ভিত্তিহীন শব্দ দ্বারা যে সকল কাজের ভিত্তি আছে সেগুলো বিদআত থেকে খারিজ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেগুলো বিদআত নয়। তারাবীর সালাতের ভিত্তি আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে তারাবী আদায় করেছেন। তার সাথে সাহাবীরা আদায় করেছেন। আর রাসূল (সা.) নিজে যে আমল করেছেন এবং তার পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদাগণ যে কাজ করেছেন তাকে কোনোক্রমেই ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় না। ওমর (রা.) যে বিদআত বলেছেন সেটা সম্পূর্ণভাবে শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় বলেছেন। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী নয়। ইমাম আবূ শামা বলেন:

وأما قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة هذه رواه البخاري في صحيحه من حديث عبـــد الـــرحمن بن عبد القاري فالمراد بذلك البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية؛ لأن عمر قال ذلك بمناسبة جمعه النـــاس على إمام واحد في صلاة التراويح، وصلاة التراويح جماعة قد شرعها الرسول صلى الله عليه وســـلم ؛ حيث صلاها بأصحابه ليالي، ثم تخلف عنهم خشية أن تفـــرض علـــيهم انظـــر: "صـــحيح البخـــاري" (২৫২/২) من حديث عائشة رضي الله عنها، وبقي الناس يصلونها فرادى وجماعات متفرقة، فجمعهـــم عمر على إمام واحد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي التي صـــلاها بهـــم، فأحيا عمر تلك السنة، فيكون قد أعاد شيئًا قد انقطع، فيعتبر فعله هذا بدعة لغويـــة لا شـــرعية؛ لأن البدعة الشرعية محرمة، لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها، وهم يعلمون تحذير الـــنبي صـــلى الله عليـــه وسلم من البدع للفائدة: انظر: كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث" لأبي شـــامة (ص ৯৩ ـــــ ৯৫) مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبـــد الله الفـــوزان، ১৯১/১، رقم الفتوى في مصدرها: ৯৪.

'ওমর (রা:) এর কথা **نعمت البدعة هذه** 'এটি কতই না সুন্দর একটি বিদআত' দ্বারা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামের পরিভাষায় যে বিদআত তা উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে শাব্দিক অর্থে বিদআত বলা হয়েছে। কেননা ইসলামের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় 'ভিত্তিহীনভাবে সওয়াবের আশায় নবউদ্ভাবিত ইবাদতকে' সুতরাং যে সকল বিষয়ের একটি শরয়ী ভিত্তি থাকবে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়, সে গুলো সম্পর্কে যখন বিদআত বলে মন্তব্য করা হয় তখন শাব্দিক বেদআত বুঝতে হবে শরয়ী বিদআত নয়। আর সালাতে তারাবীহ তো রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেই সাহাবিদের নিয়ে পড়ে ছিলেন। শেষ দিকে এসে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তিনি তার থেকে পিছিয়ে গেছেন। তবে সাহাবারা বিক্ষিপ্ত ভাবে রাসূলের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর ধারাবাহিক ভাবে পড়েছেন। এক পর্যায়ে এসে ওমর রা. সকলকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করে দিয়েছেন যেমন তারা রাসূলের পিছনে পড়ে ছিলেন। সুতরাং এটি দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন বেদআত ছিল না। বরং একটি বিলুপ্ত সুন্নাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কেননা শরিয়তের পরিভাষায় যাকে বিদআত বলা হয় তা তৈরী করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যা ওমর (রা:) বা অন্য কোন সাহাবীর পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়। কেননা বিদআতের বিরূদ্ধে যে সকল সতর্কবাণী রাসূলুল্লাহ (সা:) করেছেন তা তাদের ভাল করেই জানা ছিল।' (আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদেস, পৃষ্ঠা ৯৫)

বিদআতীদের দ্বিতীয় দলীল: বিদআতিরা নিজেদের বিদআতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরেকটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করার অপচেষ্টা করে থাকে। সেটি হলো:

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْـــلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُـــورِهِمْ شَيْءٌ

'জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে একটি ভাল সুন্নত চালু করলো, সে ওটার সওয়াব পাবে এবং পরবর্তীতে যারা তার উপর আমল করবে সে তাদের সাওয়াবও পাবে এবং আমলকারীদের তাতে কোন কমতি হবে না।' (সহীহ মুসলিম ২৩৯৮; সুনানে নাসায়ী ২৫৫৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ২০৩; মুসনাদে আহমদ ১৯১৫৬)

খন্ডন: বিদআতীদের এই হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করা সঠিক নয়। কেননা এখানে বিদআতে হাসানা চালু করার কথা বলা হয় নাই। বরং সুন্নাতে হাসানা চালু করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া এই হাদীসটি যেই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে সেটি হলো একদল অসহায় সাহাবীদেরকে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবায়ে কিরামদের নিকট আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর আহবানে সাড়া দিয়ে প্রথমে একব্যক্তি কিছু সাহায্য করলো তাকে দেখা-দেখি অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামগণও সাহায্য করতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে এই সাহায্যের পরিমান একটি বড় স্তুপে পরিণত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) খুশি হয়ে উপরোক্ত হাদীসটি বলেন। সুতরাং এ হাদীসকে বিদআতে হাসানা প্রমান করার জন্য পেশ করা আরেকটি গোমরাহী। যেমন গোমরাহী খোদ বিদআতে হাসানা।

বিদআতীদের তৃতীয় দলীল: বিদআতিরা বিদআতে হাসানা প্রমান করার জন্য কিছু উদাহরণ পেশ করে থাকে। তারা বলে যে, এরূপ আরো অনেক নতুন নতুন বিষয়ের প্রবর্তন হয়েছিল কিন্তু সালাফের কেউ সেগুলোকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন কুরআন মাজিদকে এক মাসহাফে একত্রিত করা, (যা রাসূলের যুগে ছিল না) হাদিস লেখা ও সংকলন করা এটিও রাসূল (সা:) নিজে করে যাননি, মাদরাসা ঘর তৈরী করা।

খন্ডন: বিদআতীদের উপরোক্ত যুক্তি ও উদাহরণের জবাব দিতে গিয়ে ইমাম আবু শামা বলেন:

أما ما ذكروه من بعض الأمثلة وأنها بدعة حسنة؛ مثل جمع القرآن ونسخ القرآن فهذه ليست بدعة، هذه كلها تابعة لكتابة القرآن، والقرآن كان يكتب ويجمع علـــى عهـــد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه متممات للمشروع الذي بدأه الرســـول صـــلى الله عليه وسلم ؛ فهي داخلة فيما شرعه .

"তারা যে সকল উদাহরণ পেশ করে 'বিদআতে হাসানা' বলে দাবী করেছে। যেমন: কুরআনকে একই মাসহাফে জমা করা, কুরআনকে লিপিবদ্ধ করা, মাদরাসা ঘর তৈরী করা, হাদীস সংকলন করা ইত্যাদি এগুলোর কোনটিই বিদআন নয় বরং এসব গুলোই সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা কুরআন জমা করা, কুরআনকে বিভিন্ন নুসখায় ছাপানো, এক মাসহাফে কোরআন শরীফ একত্রিত করারও শরিয়তের একটি ভিত্তি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. নিজে কোরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তাকারে ছিল

পরে সাহাবায়ে কেরাম সংরক্ষণের নিমিত্তে সবগুলোকে এক মাসহাফে জমা করেছেন। এমনকি বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এ কাজে নিয়োগ করেছিলেন। যাদেরকে 'কাতেবে অহী' বা অহীর লিখক বলা হতো। এমনিভাবে হাদীস সংকলন করা এটিও কোন বিদআত নয় বরং সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে হাদীস লেখার প্রমান আছে। রাসূল সা. কতিপয় সাহাবিকে অনুমতি প্রার্থনা করার পর কোন কোন হাদিস লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে তার জীবদ্দশায় কুরআনের সাথে গায়রে কুরআন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাপক হারে লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। কেননা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই কোরআন পূর্ণতা লাভ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে সম্পূর্ণ হয়। এরপর মুসলিমগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হাদীস সংকলনে হাত দেন।

كذلك ما قالوه من بناء المدارس، هذا كله في تعليم العلم، والله أمر بتعلـــيم العلـــم، وإعداد العدة له، والرسول أمر بذلك؛ فهذا من توابع ما أمر الله به .

অনুরপভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, লিল্লাহ বোর্ডিং চালু করা ইত্যাদিও কোন বিদআত নয়। কেননা এসব কিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানের অন্তর্ভূক্ত আর ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ (সুব:) ও রাসূলুল্লাহ (সা:) দান করেছেন। সুতরাং এসব কিছু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা:) এর আদেশের অন্তর্ভূক্ত। বিদআতে হাসানা নয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) যেখানে স্পষ্ট বলেছেন, 'সকল বিদআত-ই গোমরাহী'। সেখানে বিদআতকে হাসানা (ভাল বিদআত) আর সাইয়িয়্যা (মন্দ বিদআত) এই দুইভাগে ভাগ করে আল্লাহর রাসূল (সা:) এর বিরূদ্ধে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর রাসূল (সা:) এর উপরে কোন ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আল্লাহ (সুব:) নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রনী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।' (সুরা হুজরাত ৪৯:১)

যারা বিদআতকে হাসানা ও সাইয়্যিআ এই দুই প্রকারে ভাগ করে তারা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানতকারী বলে আখ্যায়িত করে। কেননা আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা ৫:৩)

সুতরাং যে দ্বীনকে আল্লাহ (সুব:) স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তার ভিতরে নতুন কিছু সংযোজন করার অধিকার কারও নেই। যদি করা হয় তার অর্থ দাড়াঁয় এই যে, আল্লাহ (সুব:) যদিও দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা:) সেগুলো ঠিকমত পৌছান নাই। বিধায় কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। বিদআতী আলেমগণ বিদআতে হাসান তৈরী করে সেই অংশ পূরণ করছেন। এটার বাস্তব উদাহরণ এরকম, মনে করুন! একজন এম. পি তার অধিনস্ত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়্যারম্যানদেরকে নির্দিষ্ট পরিমান গম, টাকা-পয়সা বরাদ্দ দিলেন জনগনের মাঝে তা বিতরন করার জন্য। পরবর্তীতে জনগনকে তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন জনগণ তা ঠিকমত পায়নি। তাহলে এখানে খেয়ানত করলো চেয়্যারম্যান। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ (সুব:) একটি পরিপূর্ণ দ্বীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দান করেছেন। বান্দার কাছে পৌছে দেয়ার জন্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

'হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌছালে না।' (সুরা মায়েদা ৫:৬৭)

কিন্তু এখন এক শ্রেণীর বান্দা মনে করে দ্বীন পরিপূর্ণ নয় কিছু নব উদ্ভাবিত 'বিদআতে হাসানা' ইসলামের ভিতরে সংযোজন করার অবকাশ আছে। এর অর্থ দাড়ায়, রাসূলুল্লাহ (সা:) রিসালাতের দায়িত্ব আল্লাহর বান্দাদের নিকট ঠিকমত পৌছান নাই। অথচ এরকম ধারণা করা হারাম। এক শ্রেণীর বিদআতীরা আল্লাহর রাসূল (সা:) এর বিরূদ্ধে এরকম অভিযোগ তুলতে পারে, এ আশংকা থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা:) বিদায় হজ্জের ভাষণের এক পর্যায়ে লাখো

জনতাকে সাক্ষী রেখে প্রশ্ন করলেন: وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ . 'তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আমি আমার দায়িত্ব ঠিকমত আদায় করলাম কিনা?) তখন তোমরা (আমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে) কি উত্তর দিবে?' সাহাবাগণ উত্তর দিলেন:

قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

'হ্যাঁ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর দেওয়া রেসালাত আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া আমানত আপনি ঠিকমত আদায় করেছেন এবং উম্মতের জন্য কল্যাণ কামনা করেছেন। একথা শুনে তিনি শাহাদাৎ আঙ্গুলকে আসমানের দিকে উঠাচ্ছিলেন আবার লোকদের দিকে ইঙ্গীত করছিলেন আর বলছিলেন, اللَّهُمَّ اشْهَدِ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থাক! একথা তিনি তিনবার বললেন।' (সহীহ মুসলিম ৩০০৯)

এরপরই আল্লাহ (সুব:) সীল-মোহর স্বরূপ উপরোক্ত আয়াতটি নাজিল করলেন, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা ৫:৩) সুতরাং দিন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে যারা বিদআতে হাসানা নামক ইবাদতকে ইসলামে ভিতরে ঢুকাতে চায় তারা মূলত: পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খিয়ানতকারী হিসাবে আখ্যায়িত করছে। একারণেই ইমাম মালেক (রহ:) বলেছেন:

من ابتدع بدعة فيراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان فى الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا

'যে ব্যক্তি কোন বিদআ'ত আবিস্কার করে আবার সেটাকে বিদআ'তে হাসানাহ বা ভালো বিদআ'ত মনে করে সে যেনো দাবী করলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের ভিতরে খিয়ানত করেছেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ اليوم اكملت لكم دينكم "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং যে সব কাজ তখন দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত ছিল না তা বর্তমানেও দ্বীন নয়।' (মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪)